ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উপর একটি সমীক্ষা

সেলিনা আখতার*

A Study on the Leather Industry of Bangladesh. Shelina Akter

Abstract: Leather is making noteworthy contribution to the national development of Bangladesh. It is a very important sector in achieving economic growth. In earning foreign currency it runs hand in hand with jute, tea, forzen and readymade garments. Leather stands immediately after jute and readymade garments in our export business. This study explores the market of raw leather, production of leather and export profit of leather and leather commodities in Bangladesh. It is found that a big market of annual average production amounting to 1.5 crore pieces of leather prevails. Tremendous potentialities of leather industry exist in export business which may lead, if aptly dealt with, to a huge foreign currency earning of taka four to five thousand crore instead of the present foreign currency earning of taka one thousand crore in this sector. A precondition has to be meted out, however; i.e. its problems have to be solved. This venture delves into the problematic and endeavours to set action agenda for the same.

যে ক'টি অতি পুরাতন অর্থনৈতিক সম্পদ আজও বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে চামড়া তাদের অন্যতম। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে চামড়া শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ খাত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাট, চা, হিমায়িত খাদ্য ও তৈরী পোশাকের পাশাপাশি চামড়া শিল্পের অবস্থান। বাংলাদেশের পণ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও তৈরী পোশাকের পরই এই চামড়া শিল্প। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে এক্ষেত্রে রপ্তানির মাত্রা ধার্য করা হয় ২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে তা ছিল ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । প্রকৃত আয় অর্জিত হয় মাত্র ২১১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ চামড়া থেকে ৪১০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে (হোসেন, ১৯৮৭:৫৫)। ১৯৮৮-৮৯ সালে অর্জিত হয় ৪৩৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা যা দেশের মোট রপ্তানির ১২% । বর্তমানে চামড়া শিল্প হতে প্রতি বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং এখাতে বর্তমানে যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করা গেলে বছরে প্রায় চার হতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে (কামাল, ১৯৯৯)।

অমিত সম্ভাবনার এ খাতে আয় আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক ঋণের সংকট, কারখানা প্রতিষ্ঠায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালার অভাবে এ শিল্প আজ চরম সংকটে নিমজ্জিত। অথচ সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল

*সহকারী অধ্যাপক,ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্ভর এ চামড়া শিল্পের শুধুই এগিয়ে যাওয়ার কথা। বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে এই শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অবহেলা ও নিয়মনীতির অভাবে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হচ্ছেনা। অথচ বাংলাদেশে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহের নিশ্চয়তা রয়েছে। অন্য অনেক শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানীতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় চামড়ার ক্ষেত্রে তা হয় না। ট্যানারি শিল্প আধুনিকায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা দানের দীর্ঘসূত্রিতা মূলতঃ বহু ট্যানারির জন্য ক্ষতি বয়ে এনেছে। চামড়া শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বিভাগসহ সভা, সেমিনারে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ কোন ফল হয়নি। এ রকম অনেক সমস্যা নিয়েই চামড়া শিল্পের পথ চলা।

১৯৯০ সালে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও মান্ধাতার আমলের চামড়া কারখানাগুলি আধুনিকায়ন ও উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহের নিমিত্তে সরকারি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলে চামড়া শিল্প বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে হাজার হাজার শ্রমিক। পাকা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ গত কয়েক বৎসর যাবৎ হ্রাস পাচ্ছে। পাকা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেলেও বিশ্ববাজারে দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে চামড়াজাত দ্রব্য, বিশেষ করে চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের চামড়াজাত পণ্যের মান খুব উন্নত। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের চামড়া শিল্পকে গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্তমান প্রবন্ধে চামড়া শিল্পের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত গতিধারা অনুধাবনের প্রচেষ্টা রয়েছে। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছেঃ ১) বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার বাজার নিরীক্ষণ, ২) চামড়া পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও মুনাফা সম্পর্কে জানা, এবং ৩) চামড়া শিল্পের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মনীতির অন্বেষণ করা। প্রবন্ধটি নীতি নির্ধারক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও চামড়া শিল্পের উপর অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য চট্টগ্রামের দুটি এবং ঢাকার চারটি ট্যানারি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ট্যানারিসমূহের বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা ও চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত উৎপাদক, পাইকার, বেপারী, আড়াতদারদের সাথে সংলাপের মাধ্যমেও এ শিল্পের বাস্তব অবস্থান অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। গৌণ তথ্যের ক্ষেত্রে চামড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থ, বিনিয়োগ নীতিমালা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ এবং বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও চামড়া শিল্প সংক্রান্ত সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা কর্ম, পুস্তক পুস্তিকা, গবেষণা প্রবন্ধ হতে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে এই প্রবন্ধের তত্ত্বগত কাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

চামড়া শিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিহাসবিদদের গবেষণায় দেখা যায় চামড়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ বছর আগে (হুসেইন ও করিম, ১৯৯৬)। প্রযুক্তি বিকাশের ফলে চামড়া শিল্পের অগ্রগতি ঘটে অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে। এ সময়ে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি ইউরোপিয়ান জাতি চামড়া শিল্পে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। মানব সভ্যতার প্রথমিক যুগ হতেই পাকা চামড়ার ব্যবহার চলে আসছে। অতি প্রাচীন কালে গ্রীসের সাহিত্য ও ইতিহাসে পাকা চামড়ার ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাক ঐতিহাসিক যুগে গাছের চাল বা সব্জি জাতীয় বস্তুর কষ লাগিয়ে চামড়া পাকা করার কৌশল মানুষের জানা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে মিশরে চামড়ার পোশাকের প্রচলন ছিল। আদি যুগে বন্য পশু শিকার করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। মধ্যযুগে মুসলিম দেশগুলিতে পাকা চামড়ার শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মুসলমানরাই ঐ সময়ে ইউরোপে পাকা চামড়ার প্রবর্তন করে। ঐ সময় মরক্কোর পাকা চামড়া সমগ্র ইউরোপে এর চমৎকার রং ও উৎকৃষ্ঠ মানের জন্য বিশেষ ভাবে আদৃত হত। তোমাস আরনল্ড তাঁর *লিগেসি অব ইসলাম* নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, মুসলমানদের দ্বারা প্রস্তুত কোর্দ্দবান নামক পাকা চামড়ার জন্য স্পেনের করডোবা প্রসিদ্ধ ছিল। পরে কর্দ্দোবান চামড়া দিয়ে "মুদেজার" নামক পুস্তক বাঁধাইকারী বা দপ্তরীগণ পুস্তক বাঁধার সুন্দর সুন্দর প্রণালী বের করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা ইউরোপে বড় বড় বাণিজ্যিক শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চামড়া পাকা করার জন্য নানাবিধ বস্তু এবং কলের ব্যবহার আরম্ভ হয় (হক,১৯৮৮ :১০৪)।

মধ্যযুগে থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি ইউরোপিয়ান জাতি পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশের দিকে বণিকসুলভ লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে। ইংরেজ বণিকরা এই মুনাফার পথ ধরে উপনিবেশ কায়েম করে রাজদন্ড হাতে নিয়েছিল। যে কটি পণ্য তাদের সওদাগরিকে প্রলুব্ধ করেছিল তার মধ্যে মশলা ও বস্ত্রের পাশাপাশি ছিল চামড়া। পরবর্তীতে যোগ হয় নীল ও পাট (বাবর, মীর ও করিম , ১৯৯৪)।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের ধাঁচে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা প্রথম বারের মত ভারত বর্ষের কানপুরে স্থাপিত হয়। এরপর গত একশত বৎসরের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নানাস্থানে চামড়ার কারখানা স্থাপিত হয়। তবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরই মূলতঃ এখানে চামড়ার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে ব্যাপকভাবে। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের পূর্বে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কোন কারখানা ছিল না। চর্মকার বা চামারগণ কুটির শিল্প হিসাবে চামড়া পাকা করত তবে সেই পাকা চামড়া মানের দিক থেকে খুব বেশী উন্নত ছিল না। চট্টগ্রাম হতে লবণ দেয়া শুকনা চামড়া কলকাতা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাকা করার জন্য প্রেরিত হত।

ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে অর্ধপাকা চামড়া পাকিস্তানে পাঠান হত। বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিবৃত্ত বিস্তারিত জানা যায় না। তেমন ধারাবাহিক ব্যাপক রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হয়ত কেউ বোধ করেনি। তবে যুক্তরাজ্যের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত এক রির্পোটে দেখা যায়, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনকালে ১৯২১ সালেও হাজারীবাগে ট্যানারী ছিল। অর্থাৎ এ অঞ্চলে ট্যানারীর বয়স পৌনে এক শতাব্দীর বেশী। উল্লেখ করা প্রয়োজন লীডস চর্মশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশের ২/১ জন চর্ম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ডক্টরেট নিয়েছেন। জানা গেছে এ শতকের বিশের দশকেও হাজারীবাগ থেকে কাঁচা চামড়া শুকিয়ে লীডস ও অন্যান্য বৃটিশ শহরে নেয়া হতো প্রসেসিং এর জন্য (বাবর, মীর ও করিম ১৯৯৪)। ৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেলে ভারতীয় বাটা কোম্পানীর বহু উর্দুভাষী মুসলিম কর্মচারী ভাগ্যে বিপর্যয়ের শিকার হন। তাঁরা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কবল থেকে বাঁচার জন্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন ভারত উপমহাদেশে "চর্মশিল্পের পীঠস্থান" হিসাবে পরিগণিত হতো কলকাতা ও কানপুর।

ইংরেজ শাসনের অবসান না ঘটা পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ছিল কাঁচা চামড়ার উৎকৃষ্ঠ সংগ্রহশালা। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশে চামড়া কারখানা গড়ে উঠতে থাকে রাজধানীর হাজারীরাগ, নারায়ণগঞ্জ, চট্রগ্রাম ও টাঙ্গাইলে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঢাকার হাজারীবাগও চট্রগ্রামের কালুরঘাট এলাকাকে ওয়েট ব্লু চামড়া উৎপাদানের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে। কালুরঘাটের চেয়ে ঢাকার হাজারীবাগকে তৎকালীন চামড়া শিল্পের মালিকেরা বেশী প্রাধান্য দেয়। ফলে হাজারীবাগে গড়ে উঠে শতাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ট্যানারি ইউনিট। বস্তুতঃ পক্ষে হাজারীবাগে চামড়া শিল্পের বিপুল সমাবেশ ঘটার অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে ১৯৪৯ সালের ১০ই জুন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী কর্তৃক হাজারীবাগে ইষ্টবেঙ্গল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন। হাজারীবাগের বর্তমান কলেজ অব লেদার টেকনোলজির ভবন, বিশালাকার ট্যানারি ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার স্থাপন করে সাবেক মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী চামড়া শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯৫১ সালে টাঙ্গাইলের রণদা প্রসাদ সাহা ও আরো কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জে অস্থায়ী ভাবে ট্যানারী স্থাপন করেন। প্রথমদিকে ট্যানারিগুলোতে ম্যাকানাইজেশনের লেশমাত্র ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানি ট্যানারি শিল্পের মালিকরা এদেশে কোন ম্যাকানাইজড ইউনিট স্থাপন করেনি। বড় বড় গামলায় সাধারণতঃ কেমিক্যাল মিশ্রিত করে কেবলমাত্র দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে চামড়ার প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পন্ন হতো। একারণে চামড়ার মান হতো নীচু। অপরদিকে ভারত থেকে আগত মোহাজের কর্মচারীরা অধিকাংশই ছিল কারিগর শ্রেণীর। তাদের মধ্যে মেকানিক থাকলেও আধুনিক টেকনিশিয়ান ছিল কম। তাদের অধিকাংশই কারিগর শ্রেণীর হওয়ায় চামড়া শিল্পকে সুদূর প্রসারী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা তাদের পক্ষে নিতান্তই দূরূহ কাজ ছিল।

অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চামড়ার সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠার কারণে চর্ম শিল্পের উপর ধীরে ধীরে সরকারি দৃষ্টি পড়তে থাকে। যার ফলে চামড়া শিল্প পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে এদেশে অন্যতম প্রধান অর্থকরী খাত হিসাবে স্বীকৃত হয়। এখানকার পাকা চামড়া পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা দেখে কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি তখন তড়িঘড়ি করে পশ্চিম পাকিস্তানে চালু কয়েকটি ট্যানারি বন্ধ করে দিয়ে এদেশে ট্যানারি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তারা এখান থেকে উৎপাদিত পাকা চামড়াকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে তুলেন কতগুলো

চামড়াজাত পণ্য শিল্প। এমনি এক অবস্থায় ১৯৬০ সালের দিকে কয়েকজন পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ঢাকায় সর্বপ্রথম আধুনিক ট্যানারির গোড়াপত্তন হয়। বলা যেতে পারে এসময় থেকেই চামড়া উন্নীত হয় পূর্ণাঙ্গ শিল্পে।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া ট্যানারিগুলি নিয়ে গঠিত হয় ট্যানারি পরিচালনা বোর্ড। পরে ঢাকার ২৩টি এবং চট্টগ্রামের ৭টি কারখানা নিয়ে সরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশন গঠন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে কিছু ট্যানারি সরকার বন্ধ করে দেন এবং বাকীগুলো পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন এর নিকট পরিচালনার জন্য অর্পণ করা হয়। তখন ৩টি ট্যানারি পরিচালনার ভার মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উভয়ই পরিচালনায় নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ায় ১৯৮২ সালের দিকে সবগুলো ট্যানারি ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট তার ট্যানারিগুলো থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমানে চামড়াশিল্প সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিমালিকানাধীন রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চরম গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারণে সরকারী শিল্প সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চামড়ার অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রা আনায়নকারী শিল্পখাতের মধ্যে চামড়া শিল্পের স্থান তৃতীয় (হুসেইন ও করিম, ১৯৯৬)। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ চামড়া রপ্তানি করে আয় করে ১৬৮.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। টাকার অংকে দাঁড়ায় ৬৭০.১৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে চামড়াজাত দ্রব্য থেকে বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এ শিল্পে কাজ করছে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে চামড়া খাতের মোট রপ্তানি হলো ২৩৩.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (খালেক , ১৯৯৯)। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি ট্যানারি রয়েছে। তার অধিকাংশই ১৯৫০ সালে হাজারীবাগে সরকারী ভাবে সংগৃহীত জমিতে বা তার আশে পাশে অবস্থিত। দেশের ৯০ শতাংশ ট্যানারি হাজারীবাগে, ৬ শতাংশ চট্টগ্রামের কালুরঘাট এবং বাকী ৪ শতাংশ অন্যান্য জায়গায় অবস্থিত। এই ট্যানারিগুলোর মধ্যে বছরে ৫০ লাখ বর্গফুটের বেশি চামড়া উৎপাদন করে এমন বড় ট্যানারি ১১টি, ৩০ লাখ থেকে ৫০ লাখ বর্গফুটের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাঝারী ট্যানারি ২৬টি, বাকীগুলো ছোট ও ক্ষুদ্রাকৃতির ।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির উপর হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ঢাকার হাজারীবাগের ১০৮টি ট্যানারির গুদামে ১৬০ কোটি টাকা মূল্যের ওয়েট ব্লু চামড়া জমা পড়ে ছিল। ওয়েট ব্লু চামড়ার উপর হঠাৎ করে বিধি নিষেধ আরোপ করায় তা রপ্তানী করা যায়নি বলে ব্যবসায়ীদের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানী বন্ধ করার সময় একই সাথে এমন সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল যে, যেসব ট্যানারিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই সেগুলোর উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। শতাধিক ট্যানারিকে এই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে এসে সেগুলোকে আধুনিক ট্যানারিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হবে এমন ধারণা দেয়া হলেও তা কার্যকর করা হয়নি।

ট্যানারি শিল্প আধুনিকায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তাদানের দীর্ঘসূত্রিতায় ক্রমে শদেড়েক ট্যানারী বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ও এর উপর নির্ভরশীল ট্যানারি মালিক, শ্রমিক, কর্মচারী, রপ্তানীকারক, কাঁচা চামড়া ক্ষুদ্র ক্রেতা, আড়তদারসহ প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কামাল, ১৯৯৯)। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হচ্ছে, সরকারের এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ছিল একটি অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ। কারণ সরকার সব ট্যানারিকে উন্নত করার ব্যবস্থা করেনি এবং এক সাথে তা করাও সম্ভব নয়। যদি এই কার্যক্রম ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে করা হত তবে এতগুলো ট্যানারি বন্ধ হয়ে যেত না সেই সাথে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী বেকার হতেন না।

সরকার ৬৯ টি ট্যানারিকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করার পরও এদের জন্য ব্যাংক কোন ঋণ প্রদান করেনি। ১৯৯১ সালের ১৫ জুন প্রেসিডেন্টের এক আদেশক্রমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি রুগ্ন শিল্প সেল গঠিত হবার পর সেল কর্তৃক চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত রুগ্ন শিল্পগুলোর মধ্যে চামড়া উপখাতে মোট ৬৯টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করে। এই ৬৯টি শিল্পকে পুনর্বাসন করা হলে রপ্তানী বাণিজ্যে অতিরিক্ত প্রায় ৪শ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। দেশে যে কটি আধুনিক ট্যানারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা খুব দীর্ঘকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭৭ সাল থেকে ওয়েট ব্লু চামড়ার রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা ঢিলা দেয়া শুরু হয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি ও পরিকল্পনা

কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (টি,আই,পি) কর্তৃক চামড়ার উপর একটি জরিপ পরিচালিত হয়। এসব জরিপে বাংলাদেশের কাঁচা চামড়া উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে ক্রাস্ট/ফিনিশড হিসাবে বিদেশে রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় (বাবর, মীর ও করিম, ১৯৯৪)।

ঐ জরিপের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৮৭ সালে সরকারী ভাবে দেশের চামড়া শিল্পকে ক্রাস্ট/ফিনিশড চামড়ায় রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় মোট ৬৫টি আধুনিক ট্যানারি গড়ে তোলা হয়। ঢাকার হাজারীবাগ ও চট্টগ্রামসহ দেশের চামড়া শিল্পখাতে সরকার পরিকল্পনাধীন বিএমআরই (Balancing, Modernisation, Rehabilitation and Expansion-BMRE) আওতাভুক্ত মোট ২৫টি ট্যানারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যারা সরকার প্রণীত নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এডিবি ও নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বিএমআরই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ করে। ১৯৯২ সাল হতে অধিকাংশ ট্যানারি উৎপাদন /রপ্তানী কর্মকান্ড আরম্ভ করে। কিন্তু প্রকল্পের চাহিদানুযায়ী ব্যাংক প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান না করায় অপরদিকে অধিক হারে সুদ ও কিস্তি আদায় করার কারণে সরকার পরিকল্পনাধীন বিএমআরই ট্যানারিসমূহের উৎপাদন ও রপ্তানী কার্যক্রম ব্যাহত হয়। উপরন্তু রাজনৈতিক গোলযোগ, আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজারের মন্দাভাব, উৎপাদান খরচের সাথে রপ্তানী বাণিজ্যের অসংগতি ও পরিবেশগত কারণে রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারায় গত ছয় বছরের ব্যবধানে ট্যানারীসমূহের মূলধন ঘাটতি হয়ে আর্থিক অচলাবস্থা দেখা দেয়। ফলে রপ্তানী কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কারণে ব্যাংকের সাথে লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়ায় অনেক বিএমআরই আওতার্ভুক্ত ট্যানারির ব্যাংক হিসাব সুদে আসলে বেড়ে যাওয়ায় বিপুল অংকের দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে সরকার প্রণীত নীতি এবং পরিকল্পনার আওতায় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বর্ণিত অধিকাংশ ট্যানারীগুলোর বিএমআরই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও ১৯৯২ সালের পর এই ট্যানারিগুলোর খোজ খবর সরকারের কোন মহলই রাখেনি। এদিকে চামড়া শিল্প খাতে দুটি এসোসিয়েশন বিদ্যমান থাকলে সরকার পরিকল্পনাধীন বিএমআরই ট্যানারীগুলোর বিরাজমান সংকট নিয়ে এসোসিয়েশনদ্বয় বিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। আধুনিকায়িত ট্যানারিসমূহের উন্নয়ন ও উৎপাদন কর্মকান্ড ব্যাহত হলে গোটা চামড়া শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাই হুমকীর সম্মুখীন হবে। এ

পরিপ্রেক্ষিতে, বিএমআরই ট্যানারিসমূহের বিদ্যমান ব্যবসায়িক সমস্যা নিরসনের অভিপ্রায়ে সরকার বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উচিত মামলা মোকদ্দমার পথ এড়িয়ে বিএমআরই ট্যানারিগুলোর বিদ্যমান ব্যবসায়িক সমস্যা উভয়ের স্বার্থ রক্ষায় আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা। এ ক্ষেত্রে সরকার ও ব্যাংকের বিদ্যমান নীতি নমনীয় ও পরিবর্তন হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার বাজার

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রতিদিন প্রচুর গবাদি পশু জবাই হয়। পশু দু'প্রকার বন্য ও গৃহপালিত। চামড়া শিল্পে প্রধানতঃ শেষোক্ত পশুর চামড়া ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প ও চামড়া রপ্তানি নির্ভর করে প্রধান গৃহপালিত পশু গরুর উপর। এর পর ছাগল, ভেড়া ও মহিষ। কোরবানির ঈদের সময়ই মূলতঃ বেশীর ভাগ চামড়া সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং সেগুলোই সারা বছর প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানী করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে গাবদি পশুর সংখ্যা ৫ কোটির মত। এর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার শতকরা হার যথাক্রমে ৪৬.৪৫, ১.৪৪, ৫.১৩ ও ১.৮৬ (ইসলাম, ১৯৯৪)। কোরবানির ঈদে বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ লাখ গবাদি পশু কোরবানি হয়ে থাকে। এর মধ্য গরুর চামড়া ১৮ লাখ; খাসি, ছাগল ও ভেড়া প্রায় ৩ লাখ (বাবর মীর ও করিম ১৯৯৪)। সারণী ১ এ বিশ্ব এবং বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা দেখানো হল।

সারণী- ১ বিশ্ব এবং বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা

(হাজার)

পশু		১৯৮০	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯৪
গরু	বিশ্ব	১,২১,৯,৭৫৬	১২,৭৭,৩৪৫	১,২৯৬৪১	১২,৯৪,৬০৪
	বাংলাদেশ	২৫,০৫৩	২৩,০১৫	২৩,২৪৪	২৩,৫০০
মহিষ	বিশ্ব	১২১,৭৩২	১,৩৭,৬৪৬	১,৩৯,২৩৬	১,৪২,১৮৯
	বাংলাদেশ	৪৭৪	৭৩৩	৭৭২	৮১০
ভেড়া	বিশ্ব	১০,৮৭,৯৮৫	১,১৯৯,০৩৭	১,২১,৫৬৩৩	১,২০২,৯২০
	বাংলাদেশ	৭৫০	৮৩৭	৮৭৩	৯০০
ছাগল	বিশ্ব	৪,৬৫,৩৪৮	৫,৬৯,৩৬৯	৫৭৮,০৬৫	৫৯৪,২৮৬
	বাংলাদেশ	১০,৫৬৯	১৯,৬০৪	২১,০৩১	২২,০০০

উৎস ঃ বাবর ও অন্যান্য ১৯৯৪

গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ মিলিয়ে আমাদের দেশে সারাবছরে প্রায় ২০কোটি বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়। এই চামড়ার ৪০ শতাংশই আসে কোরবানি থেকে। এই সময়ে প্রাপ্ত চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় আট কোট বর্গফুটের মত। এই চামড়ার অধিকাংশই ফাইল গ্রেডের । সংখ্যা হিসাবে আমাদের দেশে বার্ষিক গড়ে

দেড়কোটি পিস চামড়া উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ছাগল ৯০ লাখ পিস, গরু ৪৫ লাখ পিস, ভেড়া ১০ লাখ পিস এবং মহিষ ২ লাখ পিস। আর কোরবানির সময় গরু মহিষ মিলিয়ে ১৫ লাখ পিস এবং ছাগল ভেড়া মিলিয়ে ৪৫ লাখ পিস চামড়া পাওয়া যায় (রহমান, ১৯৯৮)।

সাধারণত প্রথমে পশুর চামড়া সংগ্রহ করে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। চামড়ার সবচেয়ে বড় কাঁচাবাজার হল লালবাগের পোস্তা । সংগৃহীত লবণ মিশ্রিত এসব চামড়া লালবাগের পোস্তায় সরবরাহ করা হয়। এখান থেকে চামড়া হাজারীবাগের ট্যানারিগুলোতে স্থানান্তর করা হয় ক্রাস্ট, ফিনিশড ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করার জন্য। ঢাকা শহরের কসাইটুলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও কাপ্তানবাজারেও কাঁচা চামড়া বেচা কেনা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে থেকে সারাদিনই পোস্তায় চামড়ার চালান আসে। সাধারণতঃ গ্রাম্য কসাইরা সংগ্রহকৃত চামড়া লবণ মিশ্রিত করে সপ্তাহান্তে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা পাইকারের কাছে বিক্রয় করেন। স্থানীয় বাজার থেকে একজন স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যখন চামড়া নিয়ে আসেন তখন মূল বাজারে আসার আগেই একদল ক্রেতা চামড়া কিনে নেন। এদেরকে বলা হয় ফড়িয়া। এসব ফড়িয়াদের মধ্যে আবার ছোট ছোট ব্যবসায়ী আছেন যাদের পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম তারা ছোট ফড়িয়া হিসাবে পরিচিত। এরা স্থানীয় ক্রেতাদের কাছ থেকে ৫-১০ টা চামড়া ক্রয় করে বড় ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করেন। বড় ফড়িয়ারা একসাথে অনেক চামড়া ক্রয় করে আড়তে ভাড়ায় জমা রাখেন অথবা আড়ৎদারদের কাছে বিক্রি করেন। লবণ দেয়া চামড়া আড়তে ১০-১২ দিন রাখা হয়। আড়ৎ থেকে চামড়া কিনে ট্যানারিতে নিয়ে যাওয়া হয় (প্রবাহচিত্র দ্রষ্টব্য)। সেখানে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

উৎপাদক হতে ট্যানারি পর্যন্ত চামড়ার প্রবাহচিত্র

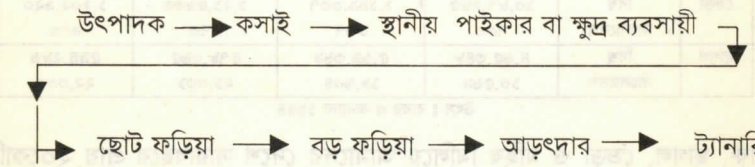

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রধান তিনটি স্তর রয়েছেঃ ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট ও ফিনিশড। চামড়া ছাড়ানোর পর চামড়া পাকা করতে যেসব স্তরে তাকে প্রক্রিয়াজাত করা হয় তার কয়েকটি স্তর হচ্ছেঃ (১) চামড়া গুদামে আনয়ন

(২) মেশিন ঘরে আনয়ন (৩) শুকানো (৪) জীবানুনাশক উপকরণ মিশ্রিত জলে ডুবানো (৫) ঘুর্ণায়মান ড্রামের ভিতরে রক্ষিত চুনের জলে ফেলা (৬) পশম ও মাংশ ছাড়ানো (৭) চুন অপসারণের ব্যবস্থা অবলম্বন (৮) পাকা করার প্রথম পর্যায় (৯) নিঙরানো ও প্রসারিতকরণ (১০) পাকা করার দ্বিতীয় পর্যায় (১১) শ্রেণীভুক্তকরণ (১২) পৃথকীকরণ ও চাঁছন (১৩) ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর রেখে রং লাগান (১৪) তৈলাক্তকরণ (১৫) পুনঃশুকান (১৬) মসৃণ ও উজ্জ্বলকরণ (১৭) পরিস্কারকরণ (১৮) চকচকেকরণ (১৯) ইস্ত্রিকরণ (২০) মাপন, বাছাইকরণ ও নির্দিষ্টমান মাফিক ক্রমভুক্তকরণ (হক, ১৯৮৮)।

চামড়ার স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য তিন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি হলো মিনারেল ট্যানেজ, ভেজিট্যাবল ও এলডিহাইড। আধুনিক জগতে মিনারেল ট্যানেজের মধ্যে ক্রোম ট্যানেজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। ক্রোমট্যানড হাইডস এর ভিজা অবস্থায় বা স্তরকে ওয়েট ব্লু ক্রোম ট্যানড বলা হয়। এই অবস্থায় চামড়া সরাসরি ব্যবহার উপযোগী হয় না। ব্যবহারপযোগী করার জন্য কী কাজে ব্যবহার করা হবে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্লু স্তরের চামড়া পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়। ওয়েট ব্লু স্তর থেকে ব্যবহারের উপযোগীর পূর্ব পর্যন্ত স্তরকে ক্রাস্ট বলা হয়ে থাকে। এই স্তরের চামড়াও পুরোপুরিভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রাস্ট চামড়াকে ফিনিশিং রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় করার পরই তা ফিনিশড চামড়া হিসাবে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, পার্স ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় (ইসলাম, ১৯৯৪)।

বাংলাদেশের ছাগলের চামড়া পৃথিবী বিখ্যাত। উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত ছাগলের চামড়া হয় তা গুণগত ভাবে অত্যন্ত চমৎকার । আমেরিকার খরিদ্দারগণ বাংলাদেশের চামড়াকে সর্বোৎকৃষ্ট চামড়া বলে স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ক্রোম টেনড চামড়ার মান ঠিক করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৯৭৪ সালে সরকারী গেজেটে মান বিষয়ক নিয়মাবলী সম্বলিত বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সেখানে চামড়াকে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শ্রেণী হিসাবে গরুর চামড়া ৮ বর্গফুট হতে ২৪ বর্গফুট এবং ছাগল ও ভেড়ার চামড়া আড়াই বর্গফুট হতে ৭ বর্গফুট পর্যন্ত হতে পারে বলে ধরে নেয়া হয়। চামড়ায় ছুরির কাটা ও রোগদুষ্ট অংশ, জোঁয়াল জনিত ঘাঁ বা বেতের আঘাতের চিহ্ন থাকলে এর মান কমে যায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উপর এক জরিপ চালিয়ে বাংলাদেশের অনেক চামড়াতে বিভিন্ন দোষ চিহ্নিত করেছে।

যেমনঃ ছাড়ানোর সময় ছুরির কাটা, চামড়ায় গরুর রোগের চিহ্ন, পোকা ধরা চামড়া, চামড়ায় ঘাঁ বা শিং এর আঘাতের চিহ্ন, চামড়ায় জোঁয়ালের দাগ ও লাঠির গুতোর দাগ, আলপিনের দাগ,হেচঁড়ানোর দাগ এবং পঁচা লাগা চামড়া।

বাংলাদেশে চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও মুনাফা

বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই প্রতিবছর চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। এদেশে উৎপন্ন চামড়াজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্যাগ, জ্যাকেট, পার্স, ভেস্ট কোট, বেল্ট, মানিব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, হ্যাভার স্যাক, ফটোস্ট্যান্ড, মেকআপ বক্স, স্যুটকেস, ব্রীফকেস, পাসপোর্ট কভার, অর্নামেন্ট বক্স ইত্যাদি। বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের বেশী চাহিদা ইউরোপ ও আমেরিকার শীতপ্রধান দেশগুলোতে। অ্যাপেক্স ট্যানারী, ঢাকা হাইড এন্ড স্কিন, ঢাকা লেদার, বাংলাদেশ লেদার, বেঙ্গল লেদার, হাবীব ট্যানারী, কোহিনুর লেদার এসব কোম্পানীর তৈরী চামড়াজাত পণ্যের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ইতালী, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, পোল্যান্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের চামড়ার পোশাক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ শিল্পে দেশ ও বিদেশের বাজারের জনপ্রিয় নাম আড়ং। ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় নিজস্ব শো-রুমের মাধ্যমে আড়ং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী চামড়াজাত দ্রব্য বিক্রি করছে। বৈচিত্রময় ডিজাইন ও মানের কারণে দেশীয় বাজারে আড়ং ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১৫টি বড় আকারের চামড়ার জুতা কারখানা রয়েছে। এগুলো জুতা রপ্তানিতে সক্ষম । অন্যদিকে প্রায় ২ হাজার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। যেগুলো স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য তৈরী করে থাকে (মানিক, ১৯৯৯)। বিশ্ববাজারে দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে চামড়াজাত দ্রব্য বিশেষ করে চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশে গরু ও ছাগলের চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ ১৮ মিলিয়ন বর্গফুট । এর মধ্যে ১৫-১৮ শতাংশ চামড়া স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট ৮২-৮৫ ভাগ চামড়া রপ্তানি করা হয়। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে মোট রপ্তানি আয়ের ১৩% অর্জিত হয় (উল্যাহ, ১৯৯৯)।

১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ৭ বছরে বাংলাদেশ হতে মোট ৯৬৩.০৫ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া রপ্তানি করা হয়। ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৪ বছরে চামড়া রপ্তানি পরিমাণ ১২.৫৪ শতাংশ হারে বাড়লেও ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে তা ১০.৫৪ শতাংশ হারে কমেছে।

বর্তমানের অবস্থা আরো উদ্বেগজনক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, ১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ মোট ১৫৫৮.৯২ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এর মধ্যে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাবদ আয় হয় ১৬৪.৩৭ মিলিয়ন ডলার (উল্যাহ, ১৯৯৯)। চামড়াজাত পণ্যের মধ্যে জুতা রপ্তানি করে ১৯৯০-৯৭ অর্থবছরে আয় হয় ৮০.৯৩ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৮৫-৮৬ অর্থবছর থেকে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ সারণী ২-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ২ঃ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ

(কোটি বর্গফুট ও কোটি টাকায়)

সন	রপ্তানির পরিমাণ	রপ্তানি আয়
১৯৮৫-৮৬	৭.২৬	১৮০.২৪
১৯৮৬-৮৭	১৩.৭৫	৪০৯.৭০
১৯৮৭-৮৮	১১.৭৬	৪৫৫.২০
১৯৮৮-৮৯	১২.৭৬	৪৩৪.৫০
১৯৮৯-৯০	১৫.৭২	৫৮৪.২৪
১৯৯০-৯১	১০.১৪	৪৭৩.৫১
১৯৯১-৯২	১২.৮০	৫৪৯.৭৫
১৯৯২-৯৩	১৩.৮৬	৫৭৪.৬২
১৯৯৩-৯৪	১৫.৭৬	৬৭০.১৬
১৯৯৪-৯৫	১৬.৭৮	৮৪৪.৪৪

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাংলাদেশে চামড়া রপ্তানির পরিমাণ কমছে তবে চামড়ার ব্যাগ জুতা ইত্যাদি রপ্তানি বাড়ছে (খালেক, ১৯৯৯)। এই বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশী নয় (সারণী-৩)। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী চামড়ার জুতায় বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। চামড়ার জুতা তৈরীতে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। বিদেশে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদার কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ এক জোড়া চামড়ার জুতা তৈরী করতে খরচ হয় ৩২ ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডে খরচ হয় যথাক্রমে ২৩.৫০ ডলার ও ১৮.৫০ ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশে একজোড়া জুতা উৎপাদন করতে খরচ হয় মাত্র ১৪ ডলার। উন্নত দেশ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে আমাদের শ্রম খরচ অনেক কম। ফলে জুতা উৎপাদানেও খরচ অনেক কম লাগে। ১৯৯৩ সালে জাপানের চামড়া শিল্পের একজন শ্রমিকের প্রতি ঘন্টায় মজুরির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩.৬৫ ডলার। অন্যদিকে কানাডা, যুক্তরাষ্ট, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও

পাকিস্তানে এ মজুরির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪.৪৪ ডলার, ১১.৬১ ডলার, ৫.৭৬ ডলার, ৩৮.৫ ডলার, ০.৫৬ ডলার ও ৪.৪৪ ডলার। অথচ বাংলাদেশে একজন দক্ষ চামড়া শ্রমিকের প্রতি ঘন্টা মজুরি ছিল মাত্র ০.২৩ ডলার। তুলনামূলক কম মূল্যের জন্য বিদেশীরা বাংলাদেশ হতে চামড়াজাত পণ্য ক্রয় করে। সরকার এখাতকে রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা করেছে (কায়সার,১৯৯৫)।

সারণী-৩ চামড়া সেক্টরের রপ্তানি আয়ের শ্রেণী বিন্যাস

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থ বছর	চামড়া রপ্তানি	চামড়ার ব্যাগ রপ্তানি	চামড়ার জুতা রপ্তানি	চামড়া জাত পণ্যের মোট রপ্তানি
১৯৯৪-৯৫	২০২.০৮	৬.৩৩	১২.৫৪	২২০.৯৫
১৯৯৫-৯৬	২১১.৭০	৬.৯৬	১৯.১৩	২৩৭.৭৯
১৯৯৬-৯৭	১৯৫.২৬	৩.৮১	১৭.৭৮	২১৬.৮৫
১৯৯৭-৯৮	১৯০.২৮	৫.৪৭	৩৮.০২	২৩৩.৭৫

উৎস ঃ খালেক ১৯৯৯।

বিদেশী বিনিয়োগের জন্য চামড়া শিল্পই বর্তমানে সর্বোত্তম ক্ষেত্র। এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ এ্যাক্ট, ১৯৮০ এর মাধ্যমে বাইরের বিনিয়োগকারীদের জন্য সব ধরনের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে একজন বিদেশী তার একশ ভাগ মালিকানায় একটি রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় সব ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। বিদেশী নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট ও ভিসা প্রদানকে সরকার সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখেছে। বিদেশী বিনিয়োগকারী যে কোন সময় তার মূলধন ও লভ্যাংশ প্রত্যাহারের অধিকারী।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের সমস্যা

সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালার অভাবঃ চামড়া সংগ্রহ, মজুতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালা নেই। চামড়া শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিশেষ প্রয়োজন একটি চামড়া নীতি। অথচ আজো দেশের জন্য একটি উপযোগী চামড়া নীতি প্রণীত হয়নি। ৯২ সালে একটি চামড়ানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। সেই কাজ সম্পন্নও হয়। এই খসড়া নীতি বাংলায় প্রণীত হয়েছিল, পরে এর একটি ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিলে তারও উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সেই অনুবাদ কাজের অগ্রগতি হয়নি বলেই জানা গেছে।

এছাড়া মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কতিপয় সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও এর যথাযথ কার্যকারিতা দেখা যায় না।

ঋণদানে ব্যাংকের জটিলতাঃ বাংলাদেশ সরকার ট্যানরিগুলোকে ঋণ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিলেও তার তেমন একটা কার্যকারিতা নেই । চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ১৯৯৮ সালে কোরবানির চামড়া ক্রয়ের জন্য ১৯৩ কোটি ১৭ লাখ টাকা মঞ্জুর করে এবং আরও ৪৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরীর প্রক্রিয়াধীন রাখা হয়। ১৯৯৭ সালে কোরবানির চামড়া ক্রয়ের জন্য ব্যাংকগুলো ২০৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করেছিল। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাংকগুলো তিন কিস্তিতে ঋণ প্রদানের নিয়ম চালু করে। ঈদের আগে প্রথম কিস্তির টাকা দেয়া হয়। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে চামড়া কিনে দেখানোর পর ঈদ পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা দেয়া হয়। ব্যাংকের এই ধাপে ধাপে ঋণ দান ও মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ঋণদানের জটিল প্রক্রিয়া চামড়া ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করছে।

ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়া ঃ সরকার ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানিকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে গোটা চামড়া শিল্পে অচলাবস্থা দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে শ'দেড়েক ট্যানারী বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ও এর উপর নির্ভরশীল ট্যানারী, মালিক, শ্রমিক, কর্মচারী, রপ্তানিকারক, কাঁচা চামড়ার ক্ষুদে ক্রেতা, আড়ৎদারসহ প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তানও দীর্ঘদিন ওয়েট ব্লু ও ফিনিশড চামড়া একই সঙ্গে রপ্তানি বহাল রেখেছে। শতকরা একশ ভাগ চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত এসব দেশ ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু বাংলাদেশ চামড়া ফিনিশড করার অবকাঠামো তৈরী ও যন্ত্রয়াণ সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ওয়েট ব্লু রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

চোরাচালানে চামড়া পাচার ঃ ফিনিশড লেদারের পাশাপাশি ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি না হওয়ায় দেশে উৎপাদিত চামড়ার এক বৃহদাংশ দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই কোরবানি ঈদের সময় দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ গরু ও ছাগলের চামড়া চোরাচালান হয়ে পাচার হয়ে যায়। অর্থের অভাবে দেশীয় বেপারীরা অনেক সময় মাঠে নামাতে পারে না। এ সুযোগে ভারতীয় চামড়া ব্যবসায়ীরা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চামড়া কিনে নিয়ে

যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশী পাচার হয় কালো রঙের ছাগলের চামড়া। ব্যবসায়ীদের ধারণা, ১৯৯৭ সালে কোরবানির ৬০ ভাগ চামড়াই পাচার হয়ে গিয়েছিল (রহমান, ১৯৯৮)।

আমলাতান্তিক জটিলতাঃ বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য উদ্যোক্তাদের কম হয়রানির স্বীকার হতে হয়না। বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়া, তোসামোদ করা, ফাইল নড়াচড়ায় কড়ির কেরামতি ইত্যাদি কারণে উদ্যোক্তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

সুদক্ষ শ্রমিকের অভাবঃ গুণগত মান ধরে রাখার জন্য যে ধরনের পর্যাপ্ত সুদক্ষ শ্রমিক থাকা দরকার তার অভাব রয়েছে। ফলে এ শিল্পের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ হচ্ছে না।

হাজারীবাগ থেকে ট্যানারী শিল্পের স্থানান্তরঃ হাজারীবাগ থেকে ট্যানারী শিল্পকে দেশের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি প্রায় ২০ বছরের পুরনো। কখনও স্থির করা হয়েছে সাভার এলাকা, পূবাইল কিংবা চট্রগ্রামে রোডের পাশে মেঘনা নদীর তীরবর্তী কোন এলাকা। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটেনি। অন্তর্বর্তী সময়ে হাজারীবাগে ট্যানারী শিল্পের বিস্তার ঘটেছে অপরিকল্পিতভাবে। সেখানকার অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো যেমন রাস্তাঘাট, ড্রেন, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চামড়া শিল্প। অন্যদিকে কোন বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট না থাকায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ও জলজ সম্পদ হুমকির মুখে।

আইন শৃঙ্খলা ঃ হাজারীবাগে ট্যানারির গোড়াপত্তনের সময় এলাকাটি ফাঁকা থাকলেও এখন তা একটি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা। যে কারণে সেকানকার ট্যানরিগুলো প্রায়শঃ বিভিন্ন আইন শৃঙখলার সমস্যা ও অনাহুত শ্রমিক সমস্যায় আক্রান্ত হচেছ। এতে করে উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে । শিল্প এলকার চরিত্র অক্ষুন্ন থাকছে না।

ঋণ খেলাপী ঃ চামড়া খাতে খেলাপী ঋণ বর্তমানে আশংকাজনক পর্যায়ে রয়েছে। এখাতে প্রদত্ত ঋণের ৫৯.৩৮ শতাংশই খেলাপী ঋণ। এ কারণেই চামড়াখাতে ঋণদানে ব্যাংকগুলোর অনীহা। ব্যাংকগুলোর বক্তব্য হলো, সরকারের নির্দেশে

প্রতিবছর বাধ্য হয়ে এই খাতে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিতে হয় চড়া সুদে কলমানি মার্কেট থেকে টাকা ধার করে। কিন্তু এর অধিকাংশই আর ফেরত আসে না। আর ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর চামড়া ব্যবসায়ী ও ট্যানারি মালিক পাইকারদের পাওনা পরিশোধ করে না। ১৯৯৮ সালে ট্যানারি মালিকরা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পাইকার ও আড়ৎদারদের বকেয়া টাকা পরিশোধ না করে নিজেরাই চামড়া খরিদ করেছে। আড়ৎদারদের টাকা না দেওয়ায় গ্রামে গঞ্জে টাকা যায়নি। ফলে গ্রামগঞ্জে পানির দরে চামড়া বিক্রি হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ পর্যন্ত চামড়া খাতে মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২১২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। যার মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৭২০ কোটি ২৮ লাখ টাকা (রহমান,১৯৯৮)। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে দেশের চামড়া শিল্প খাতে দেয়া ব্যাংক ঋণের এক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী চামড়া শিল্পে ৮টি সরকারী খাতের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনার পরিমাণ হচ্ছে মোট ঋণের ৫০ ভাগ। ৮শ ১৫ কোটি টাকাই খেলাপি ঋণে পরিণত হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০শে জুন ৯১ পর্যন্ত ২৪০টি প্রতিষ্ঠানের কাছে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩শ ৮৪ কোটি টাকা (বায়রন, ১৯৯৯)। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চামড়া শিল্পের উৎপাদিত পণ্য একশত ভাগ বিদেশে রপ্তানি করলেও আজ পর্যন্ত এ শিল্পকে ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। ফলে প্রায় ৯০ ভাগ বিদেশী কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল গার্মেন্টস ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রায় ৯০ ভাগ দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহারকারী চামড়া শিল্প। ফলে এর উৎপাদান খরচ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে।

দূষিত পরিবেশঃ নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ, মনেশ্বর রোড, ঝিগাতলার দক্ষিণাংশের রাস্তাঘাট ও আশপাশের পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে ট্যানারির বর্জ্য অংশ ও ময়লা আবর্জনার স্তুপ পড়ে থাকে। এগুলোর দুর্গন্ধে চতুর্দিকের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি সূত্রে জানা গেছে এদেশে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৩২২ । ট্যানারি শিল্পগুলোই পরিবেশকে বেশী মাত্রায় দূষিত করে। পরিবেশ দূষণ রোধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। ফলে এলাকার পরিবেশ মারাত্মক দূষিত হওয়ায় জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। ট্যানারিতে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়

সেগুলো যে শুধু এলাকার পরিবেশকেই দূষিত করে তা নয়, নদীর পানিকেও দূষিত করে থাকে।

দাদন ব্যবসাঃ পোস্তা এলাকার বেচাকেনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জমজমাট দাদন ব্যবসা। এক শ্রেণীর ফড়িয়া আছেন যাদের নগদ কোন পুঁজি নেই । তারা আড়ৎদারদের কাছ থেকে একদিনের জন্য ঋণ নেন। ঋণ নিয়ে তারা বেড়িয়ে যান কাঁচা চামড়ার খোঁজে । চামড়া কেনা বেচায় লাভ হলে আড়ৎদারদের সুদসহ টাকা একইদিনে ফেরত দিয়ে আসেন। আর চামড়া বিক্রি করতে না পারলে আড়তে রেখে দেয়। এতে ফড়িয়াদের চামড়া রাখার জন্য আড়তের ভাড়া এবং সুদসহ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়।

চামড়ার ক্ষতসৃষ্টি ও কাটাপড়াঃ বাংলাদেশের গবাদিপশুর বিকাশ স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগমুক্ত হয় না বলে চামড়া শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মারাত্মাকভাবে । এদেশে উৎপাদিত চামড়ার মাত্র ৩১ ভাগ ১ থেকে ৪নং গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকীগুলো এর নীচে থাকে। দেশে বিদ্যমান গবাদি পশু পরিচর্যা ও রোগ নিরাময় কেন্দ্রগুলোর তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । গবাদি পশু জবাইয়ের পর চামড়া ছাড়ানোর প্রক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় মূলতঃ অদক্ষ হাতে। দেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সজ্জিত কোন আধুনিক কসাই খানা নেই। বছরে গাবাদি পশুর মাত্র ১০ভাগ জবাই হয় প্রাচীন আমলের কসাইখানায়। বাকিটা হাটবাজার কিংবা রাস্তার ধারে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে করা হয়। অদক্ষ হাতে জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ চামড়া নষ্ট হয়। আমাদের দেশে চামড়া কাটা পড়ার ব্যাপারটি বিশেষ করে কোরবানির সময় ঘটে থাকে। কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়াতে অনেক অনভিজ্ঞ উৎসাহী অংশ নেয়। এ কারণে বছরে লোকাসান হয় প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানে কর্মনীতি

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানের জন্য এখনই পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করা যায়ঃ

১। চামড়া শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরী ভূমিকা পালন । চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা মনে করেন শিল্পকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের দিকে নিতে হলে সরকারকে অবশ্যই একটি সময়োপযোগী আধুনিক গতিশীল

নীতি অবলম্বন করতে হবে। অতীতে চামড়ার ব্যাপারে নীতিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি বলেই চামড়া সেক্টরে রুগ্ন শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

২। সামগ্রিক বিবেচনায় হাজারীবাগ এলাকায় ট্যানারি শিল্পের অবস্থান এদেশের চামড়া শিল্পের প্রসারে একটি বড় প্রতিবন্ধক। একে স্থানান্তরিত করা উচিত ঢাকার অদূরে । সাভার কিংবা ডেমরা অথবা অন্য কোন যুৎসই এলাকা, যেখানেই হোক না কেন, সেখানে অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় এফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থাকতে হবে। সরকারকে সকল অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। লেদার পল্লী গড়ে তোলার সূদুর প্রসারী পরিকল্পনার ভিত্তিতেই জায়গা অধিগ্রহণ করতে হবে। যাতে ট্যানারী এলাকার পাশেই স্থাপন করা যায় জুতা, লেদার, গামেন্টর্স ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরীর কারখানা। চামড়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন বাইপ্রোডাক্টের কারখানা স্থাপনের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩। ট্যানারীর পরিবেশ উন্নত করে আধুনিক মেশিনপত্র স্থাপন করা দরকার। অপারেটর, সুপারভাইজার, ও দক্ষ শ্রমিক তৈরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। মার্কেটিং ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের দিকে ট্যানারী শ্রমিকদের নজর দিতে হবে।

৪। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য বিদেশের দূতাবাসগুলোকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া দরকার। আমাদের গার্মেন্টস, সিরামিক, চা পৃথিবীময় সমাদৃত। এর পাশে চামড়া শিল্পকে তুলে ধরে বিশ্ববাজারের মুখ আমাদের দিকে ফেরানো সম্ভব। ভারত তার চামড়া শিল্পের প্রসার ও প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে একটি মার্কেটিং এজেন্সীর সহায়তা নিচ্ছে। আমাদেরকেও এধরনের এজেন্ট ঠিক করতে হবে।

৫। রপ্তানিমুখী শিল্প হলে একশ ভাগ পণ্যই রপ্তানি করতে হবে এ অবস্থার পরিবর্তন করে ৭৫ ভাগ রপ্তানির সঙ্গে ২৫ ভাগ দেশীয় বাজারে বিক্রির সুযোগ দেয়া উচিত। এতে করে লোকাল মার্কেটের পণ্যের মান ভাল হবে এবং রপ্তানিতে বাতিল হওয়া পণ্য বিক্রির একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। এতে দেশের লোকেরা আমাদের উৎপাদিত পণ্য দেখে ও কিনে গর্বিত হবে নিঃসন্দেহে।

৬। চামড়া শিল্পের আমদানী রপ্তানিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলো দূর করে এখাতেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে।

৭। চামড়ার মান বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ভারতের সিএলআরআই এর মত একটি প্রতিষ্ঠান করা যায়। লেদার টেকনোলজী কলেজের উন্নয়নের পাশাপাশি জুতা শিল্পের উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৮। সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পকে বিশ্ববাজারে আরো বেশী গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করা দরকার। চামড়া শিল্পের মাধ্যমে আরো বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হলে এই শিল্পকে আধুনিকায়ন করা দরকার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে চামড়া শিল্পকে আরো অগ্রসর করা সম্ভব।

৯। বাংলাদেশে কাঁচা চামড়া ওয়েট ব্লু বা সামান্য ট্যান করা কারখানাই বেশী। চামড়া শিল্পকে সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে গড়ে তুলতে হলে ছোট আকারের ট্যানারিগুলোকে চামড়া ক্রাস্ট ও ফিনিশড করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা দরকার। সাথে সাথে যে সব আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যানারি রয়েছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে তোলা দরকার। এ ধরনের উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশকে ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া রপ্তানির অন্যতম দেশ হিসাবে বিশ্ববাজারে পরিচয় করা সম্ভব।

১০। চামড়া প্রাকৃতিক বাই প্রোডাক্ট; এতে উৎপাদন খরচ নেই। প্রক্রিয়াকরণ করে রপ্তানি করলে ভ্যালু এডিশন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী যেমন, ব্যাগ, পার্স, বেল্ট, জুতা, গার্মেন্টস ইত্যাদি রূপে রপ্তানি করলে মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

১১। কাঁচা চামড়ার সুষ্ঠু, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী অধিক হারে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়ার খামার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর ফলে চামড়ার চাহিদা মেটার পাশাপাশি দেশে আমিষের যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং খাঁটি গরুর দুধ গুড়া দুধের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হবে। ফলে রক্ষা পাবে শিশু। রক্ষা পাবে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা।

১২। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে এ দুটি পণ্য লেদার সেক্টরের ঐতিহ্য ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে। তাই আমাদের পাকা চামড়া রপ্তানির

পরিবর্তে চামড়ার তৈরি জুতা, ব্যাগ, বেল্ট প্রভৃতি রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া উচিত।

১৩। আমাদের চামড়া শিল্পের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন এ শিল্পটিকে একশত ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা। পাশাপাশি কাঁচা ওয়েট ব্লু ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর আমদানী অবাধ শুল্ক ও গ্যারান্টি মুক্তকরণ। চামড়া শিল্পকে গতিশীল এবং বিদেশী বাজার দখলের লক্ষ্যে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিনা শুল্ক ক্যামিকেলস আমদানী বা চামড়া রপ্তানির এফওবি মূল্যের উপর শতকরা হারে ডিউটি ড্র-ব্যাক ধার্য করা প্রয়োজন। রপ্তানিমুখী এ শিল্পের যন্ত্রাংশ আমদানী শুল্ক ও গ্যারান্টি মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৪। গরু জবেহ করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কসাইখানা স্থাপন করা উচিত। এসব কসাইখানায় উৎকৃষ্ট উপায়ে চামড়া ছাড়ানোর ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৫। চোরাচালানে চামড়া যাতে পাচার হতে না পারে সেজন্য সীমান্ত এলাকায় চামড়ার সংগ্রহ কেন্দ্র খুলতে হবে। প্রতিবছর কোরবানি ঈদের পর হাজার হাজার পিস চামড়া পাচার হয়ে যায়। এদিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১৬। চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের সুদক্ষকরণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৭। জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে চামড়া শিল্পের ব্যাপক প্রচার করা প্রয়োজন।

১৮। ট্যানারীগুলোকে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া এবং জাতীয় স্বার্থে চামড়া শিল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

১৯। চামড়ার জন্য বাধ্যতামূলক মান প্রয়োগ করতে হবে।

২০। দেশে অনেক ভূয়া চামড়ার কারখানা আছে। তারা চামড়া শিল্পের নামে রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাংশ আমদানী করে চড়া দামে অন্যত্র বিক্রি করে। ঐসব ভূয়া কারখানার বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

২১। চামড়াজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদানের লক্ষ্যে আরও অধিক পরিমাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত। এতে করে বেকার সমস্যাও কিছুটা সমাধান হবে।

এছাড়া চামড়া খাতের বিরাজমান সমস্যাদি নিরসনের লক্ষ্যে এবং চামড়া শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সুপারিশকৃত নিম্নোক্ত দাবীসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে (উদ্দিন, ১৯৯৯)।

১। পোশাক শিল্পের ন্যায় চামড়াখাতে ক্রাস্ট, ফিনিশড ও চামড়াজাত দ্রব্যের ২৫ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান।

২। ট্যানারি শিল্পের খুচরা যন্ত্রাংশ শুল্কমুক্ত আমদানীর সুযোগ প্রদান করা।

৩। ফুটওয়্যার ও চামড়া শিল্পের উন্নয়নে একটি আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৪। চামড়া কাউন্সিল বাস্তবায়ন ।

৫। বন্ধ ট্যানারির ঋণ কেইস টু কেইস ভিত্তিতে পুনঃ তফসিলীকরণের মাধ্যমে বন্ধ সময়ের সুদ ও দন্ড সুদ মওকুফ করে অবশিষ্ট ঋণ সুদবিহীন ব্লক একাউন্ট নিয়ে নতুন করে ঋণ দিয়ে এদের সক্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। রপ্তানিমুখী চলমান ট্যানারি শিল্পগুলিকে ৩ শতাংশ সুদে ৫ বছরের জন্য মরাটোরিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৭। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অবিলম্বে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া। এবং

৮। পরীক্ষামূলকভাবে ৩ বছরের জন্য ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ

চামড়া শিল্প দেশের মোট রপ্তানী আয়ের ১৩% যোগান দেয়। সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠতে পারলে এ শিল্প দেশের রপ্তানি পণ্যের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। এর ইতিবাচক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছেঃ (১) উন্নত মানের চামড়া উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ খুবই উপযোগী; (২) বাংলাদেশের চামড়া

শিল্প আন্তর্জাতিক মানে স্বীকৃত, বিশেষ করে, বাংলাদেশের কালো ছাগলের চামড়া খুবই উন্নত মানের যা পৃথিবীর যে কোন চামড়া শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম; (৩) আন্তর্জাতিক চামড়া বাজারে যে সব দেশ আমাদের প্রতিযোগী হিসেবে পরিচিত তাদের অনেকেই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চামড়া দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে পারে না বলে তাদেরকে চামড়া আমদানী করতে হওয়ায় আন্ত র্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়ার চাহিদা অত্যাধিক; (৪) সম্পূর্ণভাবে দেশীয় কাঁচা মালে উৎপাদিত হওয়ায় সার্বিক মুনাফা বেশী; (৫) বাংলাদেশের সহজলভ্য শ্রমশক্তি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে এবং দেশের ইপিজেডগুলোতে জুতা ও অন্যান্য পণ্য ব্যাপক ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে।

হংকং, ইটালী, স্পেন, জাপান ও তাইওয়ানের লেদার মার্কেট আমাদের প্রতিযোগী হলেও তাদেরকে বাংলাদেশ হতে চামড়া আমদানী করতে হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে উল্লেখিত দেশগুলো বাংলাদেশ হতে মোট ১৪৩.১৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চামড়া আমদানী করে। এ চামড়ার পরিমাণ ছিল ঐ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিকৃত চামড়ার ৭৩.২২ শতাংশ। এর মধ্যে হংকং একাই ৪১.১৯ শতাংশ বা ৮০.৫২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাংলাদেশী চামড়া ক্রয় করে(উল্ল্যাহ, ১৯৯৯)।

এই শিল্পের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত, স্বাক্ষর ও নিরক্ষর লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। চামড়া সংগ্রহকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদানে সারা দেশে কয়েক লক্ষ লোক নিয়োজিত। অন্যান্য যে কোন শিল্পে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির তুলনায় চামড়া শিল্পে কম পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরী পোশাক শিল্প শীর্ষে হলেও এর বেশীরভাগ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। তদুপরি ২০০৪ সালে কোটা ব্যবস্থা তুলে দিলে পোশাক শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলে ইতোমধ্যে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সে হিসেবে তুলনামূলকভাবে চামড়া শিল্পের ভবিষৎ অগ্রগতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল

উপসংহার

চামড়া বাংলাদেশের প্রচলিত পণ্য তালিকায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় চামড়া শিল্প বিকাশের জন্য এদেশের আবহাওয়া ও পশু সম্পদ বহুলাংশে অবদান রেখেছে। ১৯৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত

এই শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছিল বেশ মন্থর। ১৯৮২ সালের পর থেকে এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে ওয়েট ব্লু এর পাশাপাশি ক্রাস্ট ও পাকা চামড়ার উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ট্যানারী শিল্পকে প্রদত্ত সরকারী উৎসাহ ও রপ্তানি নীতিতে ক্রমান্বয়ে ওয়েট ব্লুকে নিরুৎসাহিত করে ক্রাস্ট ও পাকা চামড়াকে অধিক সুযোগ প্রদান এই পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। ১৯৯০ সালে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা এদেশের চামড়া শিল্পে বিরাট প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাংকের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট চামড়া উৎপাদনের ২% -৩% উৎপাদিত হয়ে থাকে বাংলাদেশে। বিশ্বের গবাদি পশুর ১.৮% এবং ছাগল ৩.৭% রয়েছে বাংলাদেশে । বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের ছাগলের চামড়া পৃথিবী বিখ্যাত।

১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৮ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ মোট ১,৫৫৮.৯২ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এর মধ্যে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাবদ আয় হয় ১৬৪.৩৭ মিলিয়ন ডলার। গত কয়েক বছরে রপ্তানিমুখী চামড়ার জুতা তৈরীতে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে চামড়া উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান হলেও চামড়া শিল্পের হাজারো সমস্যা এই শিল্পকে সঠিক ভাবে বিকশিত হতে দিচ্ছেনা। সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালার অভাব, ঋণ দানে ব্যাংকের জটিলতা, ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়া, চোরাচালানে চামড়া পাচার, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব, চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি ও কাটাপড়া, ট্যানারী শিল্পের অস্বস্তিকর পরিবেশ, আইন শৃঙখলার অবনতি, ঋণ খেলাপী ইত্যাদি নানা সমস্যা চামড়া শিল্পের উপর মারাত্মক হুমকী সৃষ্টি করছে। এই সব সমস্যা সরকার এবং ট্যানারী শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও উন্নয়ন সংস্থাসহ দেশের দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যৌথভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের চামড়া রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে কারণ উপযোগী পরিবেশ ও আবহাওয়া। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এবং আমাদের এই চামড়া সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল । এ কথা অনস্বীকার্য যে, চামড়া আমাদের একটি সফল রপ্তানি সামগ্রী । এ সাফল্য অর্জনে খুব বেশী সময় লাগেনি। সঠিক পরিকল্পনা আর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের চামড়া শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

তথ্য নির্দেশকা

ইসলাম, মুজাহিদুল (১৯৯৪) "অবহেলিত চামড়া শিল্প: সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রতিকার"। *প্যানোরামা*, ৩রা আগষ্ট।

উদ্দিন, এম. কামাল (১৯৯৯) "সংকটে চামড়া শিল্প"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ আগষ্ট।

উল্লাহ, মুহাম্মদ রফিক (১৯৯৯) "সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্প: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর।
কামাল, ম. (১৯৯৯) "আমাদের চামড়া শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল।

কায়সার, আশরাফ (১৯৯৫) "চামড়া শিল্প আসছে: রপ্তানিতে আরেক ধাপ"। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৭জুলাই।

খালেক, এম. এ.(১৯৯৯) "চামড়ার জুতা ও ব্যাগ রপ্তানির সম্ভাবনা"। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুলাই।

বাবর, সালাউদ্দিন, আযম মীর ও মীযানুল করিম (১৯৯৪) "বাংলাদেশের চামড়া শিল্প: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত"। *প্যানোরোমা*, ৩ আগষ্ট।

বায়রন, রেজাউল করিম (১৯৯৯) "চামড়া শিল্প: ৮১৫ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি"। *ভোরের কাগজ*, ২নভেম্বর।

মানিক, নুরুজ্জামান (১৯৯০) "চামড়ার জুতা রপ্তানির সম্ভাবনা"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ সেপ্টেম্বর।

রহমান, কাওসার (১৯৯৮) "চামড়া শিল্পে কেন এই ধস?"। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ এপ্রিল।

হক, ছৈয়দ আহমুদুল (১৯৮৮) *চট্টগ্রামের শিল্প ও বাণিজ্য*, চট্টগ্রাম, চেম্বার প্রেস, পৃঃ ১০৪।

হুসেইন, দেলোয়ার ও ফজলুল করিম (১৯৯৬) "চামড়া শিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *সাপ্তাহিক রোববার*, ১ডিসেম্বর।

হোসেন, মাহমুদ (১৯৮৮-৮৯) "রপ্তানি উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধাসমূহ এবং রপ্তানিমুখী পোশাক ও চামড়াজাত দব্য রপ্তানিতে তাদের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন"। *জার্নাল অব বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন*, ভলিউম ১৪-১৫, সংখ্যা ৫।

হোসেন, মোঃ বেলায়েত(১৯৮৭) "বাংলাদেশী চামড়ার রপ্তানি বিপনন: সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *জার্নাল অব বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন*, ভলিউম ১৩, সংখ্যা ৫, ডিসেম্বর, পৃ: ৫৫।